10 MAY 2017

প্রথম আলো

পরীক্ষার ফলে উল্লাস ও বাস্তবতা

শিক্ষা | আমিরুল আলম খান

সাবেক চেয়ারম্যান, যশোর শিক্ষা বোর্ড

আমাদের দেশে সব কাজ করা হয় ঘটা করে। তাতে কাজের চেয়ে কথা হয় বেশি। বাঙালি চিরকালই কাজের চেয়ে কথায় দড়। কথায় বলে, শূন্য কলসি বাজে বেশি। আমরা যে শূন্যই তা প্রমাণের জন্য ওই কর্ণবিদারী বাজনাই যথেষ্ট।

পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ নিয়ে আদিখ্যেতা কবে প্রথম শুরু হয় তা বাঙালি ভুলতে বসেছে। এখন পরীক্ষার ফল প্রকাশের আগে গোটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘুম হারাম হয়। আগের রাতে তারা সব জড়ো হন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে। সেখানে ফলাফলের একটা আগাম পর্যালোচনা হয়, একটা লিখিত বক্তব্য প্রস্তুত হয়, যা পরদিন সকালে গণভবনে শিক্ষামন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর করকমলে সমর্পণ করে তাকে একটা ব্যাখ্যা দেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নির্বাহীর ফি বছর এই ঐকান্তিক সংশ্লিষ্টতা দেশের মানুষের ওপর কতটুকু ইতিবাচক প্রভাব ফেলে তার কোনো মূল্যায়ন বোধ করি নিষ্প্রয়োজন বিবেচিত হয়। তবে ১৬ কোটি মানুষের প্রতীক্ষার প্রহর দীর্ঘতর হয়, বেলা ১১টার দিকে প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে ফল ঘোষণা করার পরও ফলপ্রার্থীদের দুপুর ২টা পর্যন্ত এক অসহনীয় ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়; তাদের উৎকণ্ঠা সীমা ছাড়ায়। কেন এই অবস্থার কোনো প্রতিবিধান হয় না, তা জানতে চাওয়ার মতো সাহসী কোনো লোক যেমন গোটা বাংলায় নেই, তেমনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এই সামন্তবাদী মনোভাব ত্যাগের ইচ্ছাও সারাজীবন সাম্যের গান গাওয়া মন্ত্রীরও নেই।

বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা জন্মলগ্ন থেকেই। প্রায় অর্ধশত বছরেও আমরা সে অরাজকতা থেকে জাতিকে মুক্ত করার পথসন্ধান করিনি। বরং একের পর এক গিনিপিগের মতো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ওপর আত্মঘাতী পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছি। ২০১৭ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর অদ্ভুত সব কাণ্ড নজরে আসে দেশবাসীর। পরীক্ষার গড় পাসের হার গত বছরের ৮৮.২৯ শতাংশ থেকে ৭.৯৪ শতাংশ কমে এবার হলো ৮০.৩৫ শতাংশ। রাজশাহী বোর্ডে পাসের হার সর্বোচ্চ (৯০.৭) আবার কুমিল্লা বোর্ডের পাসের হার সর্বনিম্ন (৫৯.০৩)। গড় পাসের হারের চেয়ে কুমিল্লা বোর্ডের পাসের হারের পার্থক্য ২১.৩২ শতাংশ। সর্বোচ্চ হারে পাস করা রাজশাহী বোর্ডের সঙ্গে কুমিল্লা বোর্ডের পার্থক্য ৩১.৬৭ শতাংশ! কুমিল্লা বোর্ডেও 'ফল বিপর্যয়ের কারণ' হিসেবে গণিত ও ইংরেজির প্রশ্ন কঠিন হওয়ায় পাসের হার যথাক্রমে ৮১ ও ৮৬ শতাংশে নেমে যাওয়াকে দায়ী করা হয়েছে। অন্যদিকে কুমিল্লা বোর্ডের ফলই দেশের বাস্তবচিত্র এবং অন্যান্য বোর্ডের ফলে কারসাজি থাকতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। শিক্ষায় অধোগতির যে চিত্র হাসান আজিজুল হক গতকাল রাজশাহীতে বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে দেশে মাধ্যমিক পরীক্ষার অত্যুজ্জ্বল চিত্র ভীষণ বেমানানই বটে।

এবার জিপিএ ৫ও কমে গেছে বিপুল সংখ্যায়। সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য, 'নতুন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ঢালাও নম্বরদান বন্ধে'র জন্যই এটা ঘটেছে। দুর্মুখেরা বলছেন, এর অর্থ দাঁড়ায়, 'আগে তাহলে বোর্ড থেকে বেশি বেশি পাস করানোর জন্য ঢালাও নম্বর দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হতো'– এই বক্তব্যে কর্তারা তা কবুল করলেন!

কিন্তু ফলাফল বিশ্লেষণ কোনো ক্রমেই এসব দাবির সারবত্তা প্রমাণ করে না। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, এবার মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডে পাসের হার কমেছে। সিলেট (৮৩.২৬), দিনাজপুর (৮৩.৯৮), চট্টগ্রাম (৮৩.৯৯) বোর্ডের ফল আশ্চর্যজনকভাবে খুব কাছাকাছি। অন্যদিকে বরিশাল (৭৭.২৪), মাদ্রাসা (৭৬.২০) ও কারিগরি বোর্ডের (৭৮.৬৯) ফল কাছাকাছি। তার পরই যশোর বোর্ডের অবস্থান (৮০.৪০)। তুলনায় ঢাকা বোর্ডের ফল (৮৬.৩৯) বেশিই। রাজশাহী বোর্ডের ফল অন্যান্য বোর্ডের তুলনায় অস্বাভাবিক রকম বেশি। আমরা যদি সিলেট, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, মাদ্রাসা, কারিগরি ও যশোর বোর্ডের ফলের দিকে তাকাই, তাহলে এ বোর্ডগুলোর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাব। কিন্তু ঊর্ধ্ব প্রান্তিকে

রাজশাহী (৯০.৭০) এবং নিম্ন প্রান্তিকে কুমিল্লা বোর্ডের (৫৯.০৩) ফল অস্বাভাবিক মনে হবে। যদি কুমিল্লা বোর্ডে গণিত ও ইংরেজি প্রশ্ন কঠিন হওয়ার জন্য ফল বিপর্যয় ঘটে থাকে, তাহলে রাজশাহী বোর্ডের এই অস্বাভাবিক সাফল্যের রহস্য কী? সেটা তদন্ত করা জরুরি।

'নতুন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন' সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন কর্মকর্তার যে বক্তব্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা বিভ্রান্তিকর। যেমন 'এবারই প্রথম একই উত্তরপত্র (ফটোকপি) ২০ জন বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের প্যানেল মূল্যায়ন করে তার ভিত্তিতে নমুনা উত্তরপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে'; কিংবা 'আগে প্রধান পরীক্ষকরা উত্তরপত্র দেখতেন না'। ফটোকপি করে একই উত্তরপত্র ২০ জন (বা তারও বেশি) প্রধান পরীক্ষককে দিয়ে মূল্যায়ন করে নম্বর প্রদানে সমতা বিধান শিক্ষা বোর্ডগুলোয় আচরিত বহু পুরনো একটি রীতি। প্রধান পরীক্ষকদের প্যানেল আলাপ-আলোচনা করেই এই সমতা বিধান করতেন এবং প্রত্যেক পরীক্ষকের কাছে তার ভিত্তিতে প্রস্তুত নমুনা নির্দেশনা সরবরাহ করা হতো। আবার প্রধান পরীক্ষককে সাধারণ পরীক্ষকদের চেয়ে বরং কিছু বেশি উত্তরপত্র দেওয়া হতো মূল্যায়নের জন্য এবং তিনি তার অধীনে কর্মরত পরীক্ষকদের মূল্যায়ন করা উত্তরপত্রের অন্তত ১০ ভাগ বা তারও বেশি পুনর্মূল্যায়ন করতেন। কাজেই এখানে 'অভিনবত্বের যে মাহাত্ম্য' দাবি করা হয়েছে, তা একাধারে সত্যের অপলাপ এবং শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষকদের প্রতি অবমাননাসূচক।

অন্যদিকে এবারের ফলে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির উচ্ছ্বাসও যথোচিত বলে মনে করার কারণ নেই। কারণ ফল কিছুটা নিম্নগামী হলে তাতেও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে কী ধরনের গুণগত পরিবর্তন এসেছে, তা আদৌ স্পষ্ট নয়। কেননা যারা এসব দাবি করেছেন, তারা সঠিক তথ্য দেশবাসীকে জানাননি।

এই বক্তব্য দেওয়ার আগে কর্তাদের সতর্ক ও সত্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছে তা হলো, এবার 'প্রান্তিক নম্বর' সংশোধন না করে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সেটি এই যে, আগে একজন পরীক্ষার্থী পাস নম্বর বা পরবর্তী গ্রেড পয়েন্ট থেকে দু'নম্বর কম পেলে তাকে সান্ত্বনাসূচক সেই এক বা দুই নম্বর দেওয়া হতো এবং সে নির্দেশনা দেওয়া হতো গোপনে নয়, প্রকাশ্যে, লিখিতভাবে। এবার তা দেওয়া হয়নি। ফলে এমনও ঘটেছে, একজন পরীক্ষার্থী হয়তো ৭৯ পেয়েছে কিন্তু প্রান্তিক নম্বর সংশোধন করার নীতি পরিবর্তন করায় সে আর ৮০ নম্বর পেল না অর্থাৎ এ-প্লাস থেকে বঞ্চিত হলো। এমনই এক পরীক্ষার্থীর মা বিষয়টি জানতে আমাকে ক্ষুদেবার্তা পাঠিয়েছেন। আবার কেউ হয়তো ৩২ পেয়েছে কিন্তু প্রান্তিক নম্বর সংশোধন না করায় সে পরীক্ষার্থী মাত্র এক নম্বরের জন্য ফেল করেছে। এই সিদ্ধান্ত ভালো না মন্দ সেটি ভিন্ন প্রসঙ্গ। কিন্তু সরকার এটা করেছে গোপনে। অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে চালু একটি পদ্ধতি সরকার পরিবর্তন করেছে কাউকে জানতে না দিয়ে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে জনগণকে অবহিত না করে কোনো সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন কখনও কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।

আমাদের দেশে এটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে ক্রমেই। যেমন পরীক্ষার মাত্র সাত-আট মাস আগে হয়তো ঘোষণা করা হলো, এমসিকিউ নম্বর ১০ কমিয়ে সৃজনশীলে ১০ নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কখনওবা বছরের মাঝপথে সিলেবাস বদলানো হয় বা নম্বর পুনর্বণ্টন করা হয়। কিংবা পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগেও পরীক্ষার্থী নিশ্চিত হতে পারেনি যে, ২০১৬ সালে পঞ্চম শ্রেণি শেষে সমাপনী পরীক্ষা থাকবে না উঠে যাবে? কিন্তু যে কোনো শিক্ষার্থীর মৌলিক অধিকার যে কোনো পরিবর্তন সম্পর্কে সেশন শুরুর আগেই জানার। যে কোনো নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থী আগেভাগে কেন জানতে পারবে না, সে কৈফিয়ত দেওয়ার দায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারও নেই!

দুনিয়ার কোনো দেশে যখন-তখন সিলেবাস-কারিকুলামে হস্তক্ষেপ করা হয় না। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা নিরন্তর গবেষণা করেন এবং তার বিশদ পর্যালোচনা শেষে নির্দিষ্ট সময়ান্তে কারিকুলাম-সিলেবাস সংশোধন করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশ হলো অ্যাডহকের দেশ। যিনি যখন ক্ষমতা পান তিনিই সবজান্তা হয়ে ওঠেন এবং তার ব্যক্তি-ইচ্ছা ১৬ কোটি মানুষের ঘাড়ে চাপাতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোভিয়েত রাশিয়া সফরে গিয়ে সে দেশের অভাবনীয় নানা সাফল্যের তারিফ করার পাশাপাশি ছাঁচে ঢালা শিক্ষার পরিণতি ভেবে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ তা সাহসিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করেছিলেন। সমাজবাদী না হয়েও তিনি শিক্ষা কীভাবে সমাজে বৈষম্য তৈরি করেন, শ্রেণি বিভাজন ঘটান তার চমৎকার ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন।

বার্ট্রান্ড রাসেল উচিতবাদী বলে সারা দুনিয়ায় যেমন নন্দিত, তেমনি নিন্দিত। তিনি শিক্ষায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপকে নিতান্ত অবাঞ্ছিত জ্ঞান করতেন। তিনি আরও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেন, '...এডুকেশনস ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড টেন্ডস টু বি রিয়াকশনারি ফোর্স, সাপোর্টিং দ্য গভর্নমেন্ট হোয়েন ইট ইজ কনজারভেটিভ অ্যান্ড অপোজিং ইট হোয়েন এট ইজ প্রগ্রেসিভ।' এরপর তিনি বলেন, 'সুসভ্য নাগরিক গড়ার দায়িত্ব যখন রাষ্ট্র গ্রহণ করে এবং রাষ্ট্রনায়ক যদি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রতিভূ হয়, তাহলে তাদের শ্রেণিস্বার্থে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে। তখন সুনাগরিকের পরিবর্তে অধোপতিত নাগরিক তৈরি হয়। এভাবে শ্রমবিচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবন থেকে শিক্ষার বিচ্যুতি ঘটে। রাষ্ট্র ও তার পরিচালকদের হাতে শিক্ষা বন্দি হয়ে পড়ে। রাষ্ট্র তার প্রয়োজনানুসারে যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে, সেখানে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মেধা ও মননের বিকাশ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।' (বঙ্গানুবাদ, অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম)। এভাবে শিক্ষার কারণেই একটি বিশেষ শ্রেণি রাষ্ট্রের তাবত সুবিধা আত্মসাতের অধিকারী হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সংবিধানে অবশ্য চার স্তম্ভের একটি সমাজতন্ত্র হলেও সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার কোনো প্রয়াসই আমরা কখনোই গ্রহণ করিনি। বিপ্লবী কর্মসাধনের জন্য বিপ্লবী সংগঠন অপরিহার্য। বাংলাদেশে কোনো বিপ্লবী দল সরকার গঠন করেনি। সুতরাং লুটেরা দলের কাছে তেমন কিছু প্রত্যাশা করাও বাতুলতামাত্র। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মহত্তম স্মারক স্থানীয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা। কিন্তু বাংলাদেশ ক্রমেই অতিকেন্দ্রীভূত একটি রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে এবং রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে না– এমন কোনো ক্ষেত্র বাংলাদেশে অবশিষ্ট নেই। ফলে রাষ্ট্রীয় চর্চায় জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে দূরত্ব দীর্ঘতর হচ্ছে।

পাবলিক পরীক্ষার ফলে জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে বাস্তবতার সে দূরত্বই প্রকাশিত হয় মাত্র।

amirulkhan7@gmail.com